শিশু অধিকার ও সুরক্ষা

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

আমি খেলি, আমি শিখি, আমি নিরাপদ

Save the Children

শিশুর অধিকার

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুর অধিকার

বারো বছর বয়সী রিমন একটি গ্রামে বাস করে। তার বাবা বেঁচে নেই। রিমনরা দুই ভাই। বড় ভাই বিবাহিত। তাই রিমন আর তা মা থাকে বড় ভাইয়ের সংসারে। কিন্তু এখানে থেকে রিমন ঠিকভাবে তার পড়ালেখার খরচ পায় না। ফলে খরচ যোগাতে তাকে মাঝে মাঝেই স্কুলের ক্লাস বাদ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে তার মালিকও রিমনের সাথে ভালো আচরণ করে না। এদিকে প্রায়ই বাড়িতে তাকে বড় ভাইয়ের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে হয়, যার কারণে সে খেলাধুলার সুযোগও পায় না। এসব কারণে রিমন মানসিকভাবে সবসময় কষ্টে থাকে। এমনকি সে ছোট হওয়ায় পরিবারের কেউ তাকে কোনো কাজেই গুরুত্ব দেয় না।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- এখানে রিমন কোন্ কোন্ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে?
- রিমনের সাথে তার অভিভাবকদের নেতিবাচক আচরণের ফলে তার কোন্ ধরনের ঝুঁকি বেড়েছে? এর পরিণতি কী কী হতে পারে?
- রিমনের অভিভাবকেরা এ ধরনের আচরণ না করে কী করতে পারতো?
- আপনাদের এলাকায় এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে আপনারা কী করবেন?

মূলবার্তা

'শিশু অধিকার' হলো শিশুদের ন্যায্য পাওনা, যা এমনিতেই পাওয়ার কথা। এই অধিকারগুলো না পেলে একজন শিশু সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না এবং তার সঠিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এই অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১. অংশগ্রহণের অধিকার : যেমন- স্বাধীনভাবে কথা বলা ও মতামত প্রকাশ, অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা, সংঘবদ্ধ হওয়া, তথ্য ও ধারণা চাওয়া-পাওয়া এবং তথ্য প্রকাশের অধিকার। ২. বেঁচে থাকার অধিকার : যেমন- স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, পরিবারে ও সমাজে শিশুর লালন-পালন ও যত্ন, জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা। ৩. বিকাশের অধিকার : যেমন- পরিচয়, জাতীয়তা ও নাম এবং অবকাশ যাপন, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার। ৪. সুরক্ষার অধিকার : যেমন- শরণার্থী শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু, শোষণ, অবৈধ পাচার থেকে সুরক্ষা, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার থেকে সুরক্ষা, বৈষম্য ও অবহেলা থেকে সুরক্ষা, নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন থেকে শিশুর সুরক্ষা।করণীয় : শিশুদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোনো শিশু অধিকার বঞ্চিত হলে তার পরিবার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিশু সুরক্ষা কমিটি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারী হেল্পলাইন নাম্বারে জানাতে হবে।

করণীয় : শিশুদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোনো শিশু অধিকার বঞ্চিত হলে তার পরিবার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিশু সুরক্ষা কমিটি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারী হেল্পলাইন নাম্বারে জানাতে হবে।

ভালো স্পর্শ এবং মন্দ স্পর্শ সম্পর্কে জানা

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

ভালো স্পর্শ এবং মন্দ স্পর্শ সম্পর্কে জানা

এক গ্রামে বাস করতো রহিমা নামের একটি মেয়ে। পড়তো পঞ্চম শ্রেণিতে। সে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী ছিল, নিয়মিত স্কুলেও যেতো। তার শ্রেণি-শিক্ষক অন্য শিক্ষার্থীদের চেয়ে তাকে বেশি সহযোগিতা করতেন। একদিন রহিমা খুব মনোযোগ দিয়ে তার ক্লাসের কাজ করছিল হঠাৎ করে শ্রেণি-শিক্ষক রফিক কাছে এসে দাঁড়িয়ে তার মাথায় এবং পিঠে হাত বুলায়। এমন স্পর্শে রহিমা চমকে উঠে। পিছনে তাকিয়ে তার শিক্ষককে দেখতে পেয়ে রহিমা বিচলিত হলেও কিছু বলতে পারেনি। তাই শিক্ষকের এই প্রবণতা দিনদিন বাড়তেই থাকে। এক সময় রহিমা অতিষ্ট হয়ে তার বান্ধবীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। বান্ধবীরা বলে এটা কাউকে বলা যাবে না, বললে তার পরীক্ষার ফল ভালো হবে না। পরবর্তীতে সে তার বাবা-মাকে বিষয়টি জানালে তারা বিষয়টি তেমন গুরুত্ব দেন না। বলেন, শিক্ষক তোমার গুরুজন যা করেছে তোমার ভালোর জন্যই করেছে। এরপর রহিমা আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে, কারো সাথে মেশে না, বান্ধবীদের সাথে খেলে না এবং ধীরে ধীরে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- কেনো রহিমা বিষয়টি কাউকে বলতে পারেনি?
- সে প্রথম কার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিল?
- আলোচনা করে রহিমার কি কোনো লাভ হয়েছিল?
- বাবা-মার কাছ থেকে রহিমাকে কী ধরনের সহযোগিতা পাওয়া উচিত ছিল?
- এমন অবস্থায় রহিমার বাবা-মার কী করা উচিত ছিল বলে মনে হয়?
- রহিমার পরিণতি কী হয়েছিল? সে বিকল্প কী কী করতে পারত?

মূলবার্তা

ভালো স্পর্শ হলো সেই স্পর্শ যা আমাদের ভালো লাগে, যে স্পর্শে আমাদের মনে কোনো অস্বস্তি হয় না। খারাপ প্রভাব ফেলে না বা আমাদের শরীরে অথবা মনে কোনো প্রকার খারাপ অনুভূতি হয় না। যেমন : হ্যান্ডশেক করা, মাথায় হাত বুলানো। অন্যদিকে মন্দ স্পর্শ হলো এর ঠিক উল্টো। যে স্পর্শ আমাদের ভালো লাগে না, আমাদের মনে এক ধরনের অস্বস্তি হয়, আড়ষ্টতা অনুভব হয়, কষ্ট দেয়, মন খোলা হতে দেয় না, মনের ভেতর খারাপ প্রভাব ফেলে বা আমাদের শরীরে এক ধরনের খারাপ অনুভূতি হয় সেটাই হলো মন্দ স্পর্শ। মন্দ স্পর্শের ফলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়া, উদাসীনতা, খেলাধুলার প্রতি অনীহা, নিজেকে গুটিয়ে রাখা, স্কুলে অনিয়মিত হয়ে পড়া এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তা-ই নয়, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, মানসিক সমস্যাগ্রস্ত হয়ে যাওয়া, আগের মতো শিশু সুলভ চঞ্চলতা না থাকা, সারাক্ষণ একাকী থাকা ইত্যাদিও ঘটে।

করণীয় : এ ব্যাপারে বাবা-মাকে সচেতন হবার পাশাপাশি শিশুর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নারী-পুরুষ বৈষম্য ও সমতা

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

নারী-পুরুষ বৈষম্য ও সমতা

আলীপুর গ্রামে আব্দুল মজিদ নামে একজন দিন-মজুর বাস করেন। তার দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। ছোট মেয়ের বয়স-১২, বড় মেয়ের ১৪ এবং ছেলের বয়স ১৬। পর্যাপ্ত আয় না থাকায় তার পক্ষে ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালানো কষ্টকর ছিল। ফলে প্রথমে তিনি মেয়েদের পড়াশোনা করিয়ে লাভ নেই এই ভাবনা থেকে বড় মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। তখন তার স্ত্রী ও মেয়ে বাধা দিলেও কাজ হয়নি। কারণ পুরুষ বলে তিনি যা বলবেন তাই মানতে হবে। অন্যদের মতামত না নিয়েই আব্দুল মজিদ বলে 'আমি টাকা পয়সা আয় করি, আমি যা বলবো, তা-ই হবে'। এভাবে মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করলেও ছেলের পড়াশোনা চলতে থাকে। মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হতে দেন না, এমনকি ছেলেকেও অন্যদের সাথে মিশতে আর খেলতে দেন না। ছেলে বাবাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে বলে আব্দুল মজিদ মেয়েদের চেয়ে তাকে বেশি আদর করেন এবং খেতেও দেন মেয়েদের তুলনায় বেশি।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- আব্দুল মজিদের পরিবারে ছেলে ও মেয়েরা কি সমান সুযোগ পেয়েছে?
- আব্দুল মজিদের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ কী কী এবং এর নেতিবাচক প্রভাব কী?
- আব্দুল মজিদ যে কাজটি করেছে তাতে তার ছেলে মেয়েদের জীবনে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বা তাদের কী ক্ষতি হয়েছে?
- মেয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে মা-মেয়ের মতামতের কোনো গুরুত্ব ছিল কি?
- এক্ষেত্রে মেয়েদের কী কী সমস্যা হতে পারে বা ঝুঁকি থাকতে পারে?
- তারা আর কী কী বিকল্প চিন্তা করতে পারতো?
- অভিভাবক হিসেবে আমরা কী কী করতে পারতাম?

মূলবার্তা

পৃথিবীর সকল জায়গায় নারী ও পুরুষ একই রকম শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। কিন্তু সমাজ নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। আর সমাজ-সৃষ্ট এই পার্থক্যই হচ্ছে বৈষম্য। এটি মানুষের বা সমাজের সৃষ্ট এবং তা পরিবর্তনশীল। এই বৈষম্য 'নারী পুরুষ ভেদে যে কোনো প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করা যাতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন বা ছোট করে দেখা হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার মানবাধিকার লংঘন করা হয়।'

আমাদের পরিবার ও সমাজের প্রচলিত চিন্তা-চেতনা অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী পুরষের মধ্যকার বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। জেন্ডার বৈষম্যের ফলে প্রধানত মেয়ে শিশুদের অনেক অধিকার লঙ্ঘিত হয়। যেমন- শিক্ষাক্ষেত্রে, মত প্রকাশ, তথ্য আদান-প্রদান, মেলা-মেশা বা দল গঠন, যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, খেলাধুলা ও বিনোদনের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয় যা তাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলে।

করণীয় : সন্তান ছেলে না মেয়ে সে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিটি বাবা-মাকে পরিবার থেকেই সন্তানের প্রতি সমান সুযোগ দিতে হবে এবং সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

বাল্যবিয়ের প্রভাব

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

বাল্যবিয়ের প্রভাব

গ্রামীণ একটি পরিবারে তিন বোনের মধ্যে লিপি সবার বড়। তার বয়স ১৩, পড়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে। তাদের কোনো ভাই নেই। অভাবের কারণে লিপির পড়াশোনা দূরের কথা সংসারে খাবার যোগান দেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যের বাড়িতে কাজ নেয় লিপি। এদিকে তার চাচা তাদের গ্রামের জিয়া নামের ২৮ বছর বয়সী একটি ছেলের সাথে লিপির বিয়ে ঠিক করে। জিয়া লিপির মাকে তার সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অভাবের সংসার হওয়ার কারণে লিপির মা সহজেই তার অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়ে যায়। বিয়ের পর লিপি পড়াশোনা বন্ধ করে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করে এবং বছর না ঘুরতেই সে মা হয়। অল্পবয়সে মা হওয়ার কারণে লিপি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্যও ভেঙে যায়। স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক এখন ছিন্ন হওয়ার পথে। অল্প সময়ে জীবনে এতকিছু ঘটে যাওয়ায় এখন দিশেহারা লিপির চারদিক শুধুই অন্ধকার।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- লিপির পড়াশোনা কেনো বন্ধ হয়েছে?
- কত বছর বয়সে লিপির বিয়ে হয়েছে?
- লিপির ব্যাপারে তার মা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা কি সঠিক ছিল?
- লিপির মায়ের পক্ষে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল কী?
- বাল্যবিয়ের কারণে লিপি কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে?

মূলবার্তা

আমাদের দেশে অনেক কারণেই বাল্যবিয়ে হয়ে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো- অসচেতনতা, দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, যৌতুকপ্রথা, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোড়ামী, মুরুব্বিদের প্রতিশ্রুতি, প্রলোভন, ভালো ছেলে পেয়ে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকা, মেয়েদের শিক্ষার প্রতি বাবা-মায়ের কম গুরুত্ব দেয়া, ইভটিজিং। বাল্যবিবাহের কারণে অপরিণত বয়সের ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। যেমন- যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া, পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়া, স্বাস্থ্যহানী, অল্পবয়সে গর্ভধারণ, অনিরাপদ মাতৃত্ব ও মৃত্যুঝুঁকি, শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, অপুষ্ট শিশুর জন্মদান, বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ ও মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব।

করণীয় : বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন এবং শাস্তির বিধান সম্পর্কে সকলকে জানানো, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যৌতুকপ্রথা বন্ধ করা।

শিশুর অধিকারে অভিভাবকের সচেতনতা

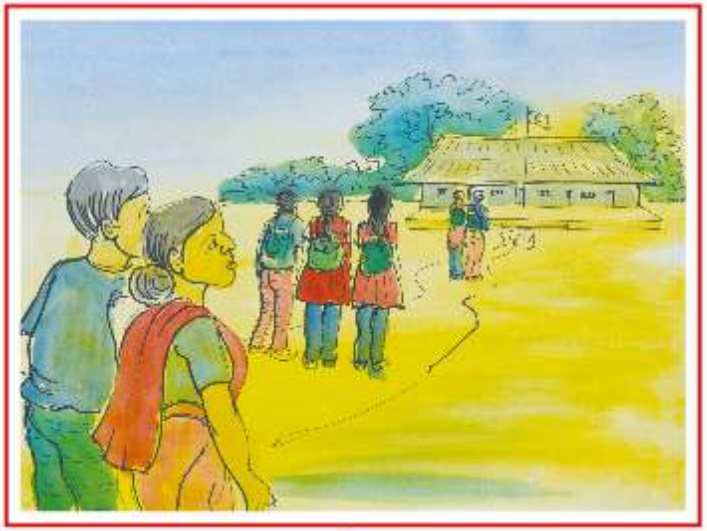

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুর অধিকারে অভিভাবকের সচেতনতা

১৪ বছর বয়সী মিনা থাকে সবুজে ঘেরা একটি গ্রামে। পড়ে সপ্তম শ্রেণিতে। তার বাবা একজন কৃষক, মা গৃহিণী। মিনাদের পরিবারে আরো আছেন বৃদ্ধ দাদা-দাদি, এক চাচা এবং ৯ বছর বয়সী তার ছোট ভাই রাজু। তাদের পাশের বাড়িতেই থাকে মধ্য বয়সী এক দোকানি চাচা। মাঝে মাঝেই সেই চাচা মিনাকে বিরক্ত করে। আজেবাজে কথা বলে, আপত্তিকরভাবে তাকায়, এটা ওটা দেবার ছলে তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। এভাবে সেই দোকানি চাচা তাকে প্রায়ই উত্যক্ত করে। এজন্য বেশিরভাগ সময় তার মন খারাপ থাকতো, পড়াশোনা ও কাজে মন বসতো না। পরে মিনা একদিন বিষয়টা তার বাবা-মাকে জানায়। দোকানি চাচা প্রতিবেশী এবং মধ্যবয়সী বলে প্রথমে তারা মিনার নালিশে খুব একটা কান না দিলেও একদিন মিনার মা হাতে-নাতে মিনাকে উত্যক্ত করার বিষয়টি দেখে ফেলে। পরে গ্রামের লোকজনের মাধ্যমে বিচার হয়। দোকানি চাচা সবার কাছে মাফ চেয়ে এমন কাজ আর কোনোদিন না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাবা-মা মিনাকে তার সাহসিকতার জন্য বাহবা দেয়। মিনা এখন তাদের গ্রামে তার বয়সী মেয়েদের এ বিষয়ে তার মতো সাহসী হবার পরামর্শ দেয়।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- মিনা কী ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিল?
- মিনার দোকানী চাচার আচরণের নেতিবাচক দিক ও মিনার জীবনে এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলো কী কী?
- এমন ক্ষেত্রে মেয়েদের কী কী সমস্যা হতে পারে বা ঝুঁকি থাকতে পারে বলে মনে করেন?
- মিনা আর কী কী বিকল্প চিন্তা করতে পারতো?
- অভিভাবক হিসেবে আমরা কী কী করতে পারতাম বলে মনে করেন?

মূলবার্তা

শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে অভিভাবক ও যত্নপ্রদানকারী সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি শিশুর প্রয়োজন, চাহিদা ও সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে অভিভাবককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও যত্নপ্রদানকারীদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো হচ্ছে- শিশুর সামনে মা-বাবা একে অপরের সাথে ঝগড়া বিবাদ না করা, রাগের মাথায় শিশুকে গালাগালি না করা, শিশুদের সাথে গল্প করা, তাদের কী ভালো লাগে খারাপ লাগে সেই সম্পর্কে জানা। শিশুদের ভালো কাজ বা কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা বা পুরস্কৃত করা। ছোট খাট ভুল করলে যেমন- কোনো কিছু নষ্ট বা ভেঙ্গে ফেললে শিশুকে শারীরিক অথবা মানসিকভাবে আঘাত না করা।

করণীয় : পারিবারিক ক্ষেত্রে শিশুর মতামত প্রদান ও সামাজিক কাজে শিশুদের সমান অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সমান সুযোগ প্রদান করা এবং শিশু সুরক্ষা নীতিমালা মেনে চলা।

অনিরাপদ স্থানান্তর

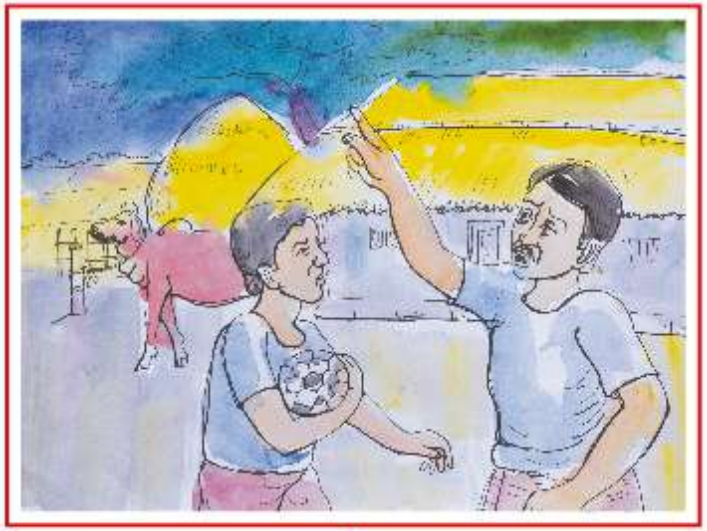

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

অনিরাপদ স্থানান্তর

সাগর নামে বারো বছর বয়সী একটা ছেলে এক গ্রামে বাস করতো। তার বাবা বাজারের দোকানে কাজ করতো, আর মা ছিলেন গৃহিনী। পরিবারে সাগরের আরো তিন বোন এবং দুই ভাই ছিল। সাগরদের সংসারে সারাবছরই অভাব-অনটন লেগে থাকতো। একমাত্র উপার্জন¶ম বাবার উপর সংসারের অনেক চাপ ছিল। অনেক ভাইবোন, তাদের পড়ালেখার খরচ, খাওয়াদাওয়ার খরচ আরো কত কী। সাগরের বাবা প্রায় দিনই বাড়িতে এসে মায়ের সাথে ঝগড়া বিবাদ করত। গত বছর থেকে সাগরের বড় দুই বোনের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সাগরের বাবা সাগরের সাথেও খারাপ ব্যবহার করতেন। বলতেন 'এত বড় ছেলে সারাদিন খেলা করে বেড়াস, সংসারের এত অনটন চোখে দেখিস না!' এর কদিন পর সাগরকে এলাকায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক খোজাখুঁজির পরও সাগরকে কোথাও পাওয়া গেল না। মাস যায়, বছর যায় সাগরের কোনো খবর নেই। সাগরের মা একা একাই কাঁদেন আর ঢাকায় যাচ্ছে এমন কাউকে পেলেই বলেন, আমার সাগরকে ঢাকা শহরে পাও কিনা দেখো। এভাবে প্রায় ৩ বছর পর একদিন তাদের গ্রামের এক লোক ঢাকা থেকে ফিরে সাগরের বাবাকে জানায় তাদের ছেলে সাগরকে সে ঢাকার একটি ফুটপাতে ভি¶া করতে দেখেছে।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- সাগর কেনো বাড়ি থেকে চলে গেল?
- সাগর যেখানে গেছে সেখানে কেমন আছে?
- সাগরের যাওয়ার পথে বা যেখানে আছে সেখানে কী কী সমস্যা হতে পারে বা ঝুঁকি থাকতে পারে?
- বাড়ি থেকে সাগর যাওয়ার আগে আর কী কী বিকল্প চিন্তা করতে পারতো?
- অভিভাবক হিসেবে সাগরের এই অনিরাপদ স্থানান্তর প্রতিরোধ বা ঠেকানোর জন্য আমরা কী কী করতে পারতাম বলে আপনারা মনে করেন?

মূলবার্তা

বিভিন্ন কারণে অনেক শিশু একা বা বন্ধু-বান্ধব ও দালালের সাথে গ্রাম থেকে শহরে অথবা এক এলাকা অন্য এলাকায় চলে যায়। বসবাসের এই স্থান পরিবর্তনকে স্থানান্তর বা অভিবাসন বলে। যখন কোনো শিশু তার গন্তব্যস্থান, যাত্রাপথ ও গন্তব্যস্থানের পরিস্থিতি, গন্তব্যস্থানে গিয়ে তার জীবন-যাপন এর উপায়, বিভিন্ন বিপদ বা ঝুঁকির বিষয় না জেনেই বা বিবেচনা না করেই স্থানান্তর করে; তখন সেটাকে অনিরাপদ স্থানান্তর বলে।

অনেক কারণেই এই স্থানান্তর হয়। যেমন- বাবা-মার আর্থিক দৈন্যতা বা চরম দারিদ্রতা, বাবা-মার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, পরিবারে যত্নের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন-ঝড়, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভলোচ্ছস), পড়ালেখা বা পরীক্ষার ফলাফলে খারাপ করলে, সামাজিক ও পারিবারিক বৈষম্য থাকলে অনিরাপদ স্থানান্তর বেশি ঘটে থাকে।

অনিরাপদ স্থানান্তর-এর অনেক ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। যেমন- যাওয়ার পথে বিপদের মুখোমুখি হওয়া, জীবন ধারনের মৌলিক উপাদান- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন এসব থেকে বঞ্চিত হওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম বা পেশায় নিয়োজিত হওয়া, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হওয়া, চিকিৎসার অভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে মানবেতর জীবনযাপন ও অকালে মৃত্যুবরণ করা। এছাড়াও অসৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া অনিরাপদ স্থানান্তর-এর ঝুঁকি।

করণীয় : প্রতিটি পরিবারের বাবা-মা ও অভিভাবককে অনিরাপদ স্থানান্তরের ঝুঁকি সম্পর্কে জানাতে হবে, বোঝাতে হবে এবং সেইসাথে এ বিষয়ে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে।

শিশুর বিনোদন ও খেলাধুলার অধিকার

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুর বিনোদন ও খেলাধুলার অধিকার

রুবি ও কবির, সমবয়সী দুই চাচাতো ভাই-বোন। রুবির বাবা-মা তার পড়াশোনার বিষয়ে সবসময় নজরদারী করেন। খারাপ ও সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাবা-মা তাকে বাইরে যেতে দেন না। খেলতে ও অন্যদের সাথে মিশতেও দেন না। রুবি সারাদিন একই কাজ করে করে বিরক্ত হয়, কারো সাথে মিশতে পারে না বলে মন খারাপ থাকে এবং পড়াশোনায় আগ্রহবোধ করে না। সে প্রায়ই জ্বর-সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত থাকে। অন্যদিকে, কবির পড়াশোনার পাশাপাশি অবসর সময়ে গ্রামের অন্যান্য শিশুদের সাথে নিয়মিত খেলাধুলা করে। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণে যায়। সে নিজ এলাকার বিভিন্ন স্থানে নানারকম খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। তাকে গ্রামের সবাই চেনে এবং তার অনেক বন্ধুও আছে।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- রুবির মা-বাবা কী কী কারণে সাড়া দেয়নি? সাড়া না দেয়ার কারণে রুবির জীবনে কী প্রভাব পড়েছে?
- কবির কেনো এতো ভালো?
- রুবি ও কবিরের মধ্যে কার বিকাশের সুযোগ বেশি এবং কেনো?
- অন্যদিকে, কবিরের সবকিছুতে এত ভালো করার কারণগুলো কী কী?
- খেলার অধিকার বঞ্চিত হলে শিশুদের কী কী সমস্যা হতে পারে বা তারা কী ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে আপনি/আপনারা মনে করেন?
- রুবি আর কী কী বিকল্প চিন্তা করতে পারতো?
- অভিভাবক হিসেবে আমরা কী কী করতে পারতাম এবং আমাদের কী করা উচিত?

মূলবার্তা

সাধারণভাবে আনন্দ লাভের জন্য শিশুরা যা করে তা-ই খেলাধুলা। এক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি, প্রতিযোগিতা, উপকরণ ও জয়-পরাজয় নয় বরং আনন্দ লাভই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। তবে এখন বাবা-মায়েরা একে সময়ের অপচয় ও ভীতিকর বিষয় মনে করে। যা শিশুর সঠিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। খেলাধুলা ও অবসর শিশুদের ভয় দূর করতে সহায়তা করে এবং নিজের প্রতি, কাজের প্রতি তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে খেলাধুলা শিশুদের প্রাথমিক হাতেখড়ি হতে পারে। এর মাধ্যমে শিশুদের বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিকতা তৈরি হয়। মুক্তভাবে খেলতে দিলে শিশুদের সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি ও কর্মদক্ষতাসহ অন্যান্য দিকগুলো বৃদ্ধি পায় বা বিকশিত হয়। প্রতিটি বাবা-মায়েরই এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

করণীয় : যেহেতু খেলাধুলা প্রতিটি শিশুর সুস্থ বিকাশের সাথে সরাসরি জড়িত তাই এই বিষয়টির প্রতি দায়িত্ববান হয়ে সকল বাবা-মা ও অভিভাবককে শিশুকে নিয়মিতভাবে খেলাধুলা করার সুযোগ করে দিতে হবে।

শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

রাজিব এমন একজন শিশু জন্ম থেকেই যার একটি পা বাঁকা। তারা চার ভাই বোন। তার অন্য ভাইবোনেরা নিয়মিত স্কুলে গেলেও রাজিবকে স্কুলে যেতে দেয়া হয় না। এমনকি বাড়িতে মেহমান এলেও তাদের সামনে রাজিবকে যেতে দেয়া হয় না। কিন্তু রাজিবের অনেক ইচ্ছে হয় যে সে অন্য ভাইবোনদের মতোই স্কুলে যাবে। সবার সাথে মিলে মিশে খেলাধুলা করবে। বন্ধুদের সাথে নিয়ে ঘুরতে যাবে। কিন্তু ঘরে এসব কথা জানলে বাবা-মা তাকে বকা দেয়। বাঁকা পায়ের কারণে খোটাও দেয়। বাবা-মা বোঝায় সে অন্য শিশুদের মতো সাধারণ স্বাভাবিক শিশু নয়। তাই রাজিবের মন সব সময়ই খারাপ থাকে, কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- যদি কারো বাড়িতে বা এলাকায় রাজিবের মতো কেউ থাকতো তখন আপনারা কী করতেন?
- কেনো রাজিবের বাবা-মা রাজিবের সাথে এমন ব্যবহার করতো বলে মনে করেন?
- রাজিবের বাব-মা রাজিবের সাথে যে আচরণ করতো তাকে কোন্ ধরনের নির্যাতন বলে?
- সত্যিকার অর্থে রাজিবের বাবা-ময়ের কী করা উচিত ছিল?
- অভিভাবক হিসেবে রাজিবের জন্য আমরা কী কী করতে পারতাম বলে মনে করেন?

মূলবার্তা

পরিবারে শিশুকে অবহেলা করলে তার উপর অনেক ধরনের খারাপ প্রভাব পড়ে, যেমন- অবহেলিত শিশু হীনমন্যতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, তার প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পায় না, অন্যের সাথে মেলামেশা করতে পারে না, অন্যদেরকে অসম্মান করতে শেখে, নিজেকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে, নিজেকে অসহায় ভাবে।

শিশুর উপর মানসিক নির্যাতনের ফলও খুব খারাপ হয়। যেমন- শিশু প্রতিবন্ধী হতে পারে, তার স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হয়, শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়, সৃজনশীল ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়, সবাইকে সে অবিশ্বাস করে, তার আত্মবিশ্বাস কমে যায়।

অন্যদিকে শিশুর প্রতি শারীরিক নির্যাতন করা হলে শিশুর জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেমন- শিশুর শারীরিক, মানসিক, মেধার বিকাশ ব্যাহত হয়, কানে আঘাত করলে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে। মানসিক সমস্যা হতে পারে, হিংসাত্মক মনোভাব নিয়ে বড় হয়। সেইসাথে মাদকাশক্তি ও অনৈতিক কাজ বা বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে।

করণীয় : বাবা-মা-অভিভাবক সকলকে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। সেইসাথে এসবের ঝুঁকি সম্পর্কে বুঝিয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

শিশুশ্রম ও ঝুঁকি

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুশ্রম ও ঝুঁকি

গ্রামের এক গরিব পরিবারে বাস করে নয় বছরের মনি। সংসারের অভাবের কারণে মনির বাবা-মা তাকে শহরের এক বাসায় কাজ করতে পাঠায়। সেখানে তাকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। কোনো কাজে ভুল হলে খুব মার খেতে হয়। ঘরের অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজও তাকে দিয়ে করানো হয়। সারাদিন সে বিশ্রাম নেওয়ারও সময় পায় না। এই বাড়িতে তার বয়সী একটি ছেলে থাকে। সে স্কুলে পড়ালেখা করে। মনি মাঝে মাঝে ছেলেটির স্কুলের বইগুলোতে হাত নেড়ে চেড়ে দেখে আর ভাবে সে যদি পড়াশোনা করতে পারতো! দুপুরে যখন এ বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে থাকে মনি তখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিকেলে জানালা দিয়ে তার বয়সী বাচ্চাদের হাসিখুশিভাবে খেলতে দেখে তার খুব মন খারাপ হয়। সে যে কতদিন বাইরে খেলতে যেতে পারেনি! কাজ করতে করতেই মনি ভাবে তার ভাগ্যের এই অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন হবে না? এর কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- এই গল্প থেকে আমরা শিশুদের উপর কী কী নির্যাতন দেখতে পাই?
- শিশুশ্রমের কারণে শিশুরা কী ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মনে করেন?
- তারা কী কী ঝুঁকিতে রয়েছে বলে আপনাদের মনে হয়?
- তারা কী স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারছে? না পারলে কোনো পারছে না বলে মনে করেন?
- অভিভাবক হিসেবে মনির জন্য আমরা কী কী করতে পারতাম বলে মনে করেন?

মূলবার্তা

একটি শিশু জন্ম গ্রহণের পর সে বাবা-মা-পরিবারের সবার আদর ভালোবাসা নিয়ে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সবসময় সব শিশুর ভাগ্যে এই সুযোগ হয় না। এর প্রধান কারণ দরিদ্রতা। পরিবারের বিচ্ছিন্নতার কারণেও অনেক শিশু পরিবার থেকে হারিয়ে যায় এবং জীবনযাপনের জন্য তাকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে হয়। এতে করে শিশুরা শিক্ষাসহ অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ঝুকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে শারীরিক সমস্যায় পড়ে।

সাধারণত মৌলিক অধিকার বঞ্চিত শিশুরা যখন বেঁচে থাকার তাগিদে কোনো কাজে নিযুক্ত হয় তখন তাকে 'শিশুশ্রম' বলা হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, শিশুদের আর্থিক লেনদেনসহ অথবা আর্থিক লেনদেন ছাড়াই কোনো কাজের জন্য নিয়োগ করা করা হলে তা শিশুশ্রমের আওতায় পরবে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রায় ৩০১ ধরনের অর্থনৈতিক কাজ-কর্মে শিশুরা শ্রম দিচ্ছে। শিশুশ্রম শিশুদের জীবনের একটি অমানবিক অধ্যায়। এর কারণে তাদের স্বাভাবিক মেধার কোনো বিকাশ ঘটে না। ফলে শিশুরা অন্ধকারে থেকে যায়।

করণীয় : শিশুশ্রমের ক্ষতিকর দিকগুলো এবং ঝুঁকি সম্পর্কে বাবা-মা-অভিভাবক সকলকে জানতে ও বুঝতে হবে। আমাদের সবার উপলব্ধি আর সচেতনতাই রুখতে পারে শিশুশ্রম।

শিশুদের জন্য বিভিন্ন সেবাসমূহ

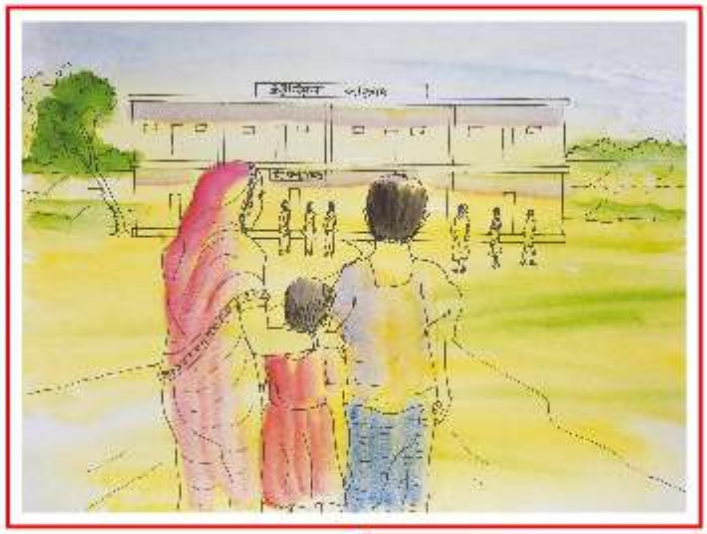

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

Save the Children

শিশুদের জন্য বিভিন্ন সেবাসমূহ

নাজমা খাতুন নামের মেয়েটি ৫ম শ্রেণিতে পড়তো। সে পড়াশোনায় খুব মনোযোগী ছিল, নিয়মিত স্কুলে যেতো। ছোটবেলাতেই তার বাবা মারা গেছে। তার মা বাসা-বাড়িতে কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালায়। এক বছর আগে নাজমার মায়ের পায়ে একটি ইনফেকশন হওয়ায় নাজমা দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্কুলের এক শিক্ষকের মাধ্যমে সে তাদের এলাকার একটি সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারে। পরে তাদের ইউনিয়নের একজন ওয়ার্ড কমিশনারের মাধ্যমে তার মাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুস্থতার জন্যই তার মায়ের একটি পা কেটে ফেলতে হয়। ফলে নাজমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। পরে সমাজভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একটি এনজিওর সহযোগিতায় নাজমা আবারো স্কুলে ভর্তি হয়। অন্যদিকে কয়েক মাসের মধ্যে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তার মায়ের প্লাস্টিকের একটি পা লাগানো হয়। বর্তমানে নাজমার মা আবারো বাসাবাড়িতে কাজ করছে। ফলে তাদের সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। নাজমা এখন জীবনে অনেক বড় হবার স্বপ্ন নিয়ে স্কুলে যায়।

অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশ্ন রাখুন :

- নাজমা কার মাধ্যমে সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে?
- কারা নাজমার মায়ের পা সংযোজন করতে সহায়তা করে?
- নাজমা শিক্ষা সহায়তা পায় কার মাধ্যমে?
- আপনাদের এলাকায় এ ধরনের কী কী সেবা প্রতিষ্ঠান আছে?
- অভিভাবক হিসেবে নাজমার জন্য আমরা কী কী করতে পারতাম বলে মনে করেন?

মূলবার্তা

সেবা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধাকে। আমাদের দেশের সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান অসহায় ও দরিদ্র শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। কোন্ সংগঠন কোন্ বিষয়ে সহযোগিতা করে, কাদের সহযোগিতা করে, সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্যতা কী, কীভাবে সহযোগিতা পাওয়া যায় সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সবারই জানা থাকা ভালো। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজের প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সেবা পাবার অধিকার রয়েছে।

করণীয় : স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অথবা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় যেসব সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার খোঁজ খবর নিয়ে রাখা দরকার। এসব সেবা নিজেদের শিশুর জন্য অথবা অন্য কোনো প্রতিবেশীর শিশুর জন্য অনেক সহায়ক হতে পারে।

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের নিয়ম

কতগুলো বাস্তবধর্মী গল্পের মাধ্যমে এই ফ্লিপচার্টটির বিভিন্ন পাতা পরিকল্পনা করা হয়েছে যার একদিকে আকর্ষণীয় রঙিন ছবি এবং অন্যদিকে কাহিনী বর্ণিত আছে। সেবা প্রদানকারীর সুবিধার জন্য প্রতিটি পাতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি ও শিরোনাম দেয়া আছে।

ফ্লিপচার্টটি ব্যবহারের আগে সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই এর প্রতিটি পাতা ভালো করে পড়ে নিতে হবে, যাতে গল্পটি সম্পর্কে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা থাকে।

- যেন গল্প বলছেন- এমনভাবে আলোচনা শুরু করলে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ সহজেই পাওয়া যাবে।
- ফ্লিপচার্টটি অংশগ্রহণকারীদের সামনসামনি ও এমন উচ্চতায় রাখতে হবে যেন প্রত্যেকে সহজে দেখতে পায়।
- সেবা প্রদানকারীকে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কৌশল অবলম্বন করে রঙিন ছবিগুলো অংশগ্রহণকারীদের দিকে রেখে উল্টোদিকের তথ্যের সাহায্যে তাদেরকে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলতে হবে।
- সবাইকে গোল হয়ে বা 'ইউ' বা 'ভি' আকারে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আলোচনা করার জায়গায় পর্যাপ্ত আলো আছে কিনা এবং সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছবি ঠিকমতো দেখতে পারছে কিনা, তা লক্ষ্য রাখতে হবে।
- উপস্থিত সকলে মনোযোগ দিচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলোচিত বিষয় ও ছবিগুলো তারা বুঝতে পারছে কিনা তা আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে জেনে নিতে হবে।
- আলোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে, অংশগ্রহণকারী যাতে তাদের নিজস্ব মতামত দিতে পারে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সঠিক আচরণটি চিহ্নিত করতে পারে।
- আলোচনা শেষে সেবা প্রদানকারী সারসংক্ষেপ বলে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দেবেন এবং এ ধরনের আলোচনা অধিবেশনে আগামীতে যোগদান করতে অনুরোধ জানাবেন।

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

২/৪, লালমাটিয়া, ব্লক-জি,মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
Emai: info@breakingthesilence.bd.org Website: www.breakingthesilence.bd.org